

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির নিশ্চয়তা

নাসরীন জাহান লিপি

চারিদিকে আতংকের কথা শুনছি। যা খাচ্ছি, তা ভেজাল নয় তো? অনলাইনে ‘খাঁটি’ বলে খাদ্যপণ্য বিক্রির হিড়িক। অফলাইনে পণ্যের প্যাকেটের গায়ে হালাল স্টিকার থাকলেও খাদ্যপণ্যটি নিরাপদ কি না, তা ভেবে হয়রান হচ্ছি। শিশুখাদ্যে ভেজাল। ওষুধে ভেজাল। পানি নিরাপদ নয়। ভাবুন তো, আমরা কি খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির নিশ্চয়তা পাচ্ছি?

সংক্ষেপে উত্তর হলো—আংশিকভাবে পাচ্ছি, কিন্তু সবার জন্য নয়। খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security) বলতে বোঝায়, প্রত্যেক মানুষ যেন সব সময় পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার পায়। আর পুষ্টির নিশ্চয়তা ((Nutrition Security)) বলতে বোঝায়, শুধু পেট ভরানো নয়; শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি — প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ, স্বাস্থ্যকর চর্বি ইত্যাদিও নিশ্চিত হওয়া।

ইউনিসেফের দেওয়া তথ্য যাচাই করে বাস্তবতা দেখি চলুন। দেশে আনুমানিক ১ কোটি শিশু খাদ্য-দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। যেসব শিশু বৈচিত্র্যময় খাবার পায় না, তাদের অপুষ্টি হওয়ার ঝুঁকি প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি। বর্তমানে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বাকৃতির হার প্রায় ২৪-২৫শতাংশ, যা অতীতের তুলনায় অনেক কম। তবে এই হার এখনও প্রতি চারজনে প্রায় একজন শিশুকে নির্দেশ করে, তাই সন্তুষ্টির সময় এখনও আসেনি। এখনও চিন্তার কারণ হয়ে আছে সেই ২৯.৫শতাংশ শিশুরা, (৬-২৩ মাস বয়সী) যারা ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য পায়। অর্থাৎ, ১০ জন শিশুর মধ্যে প্রায় ৭ জনই পর্যাপ্ত বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত। এর অর্থ, তারা প্রতিদিন সুস্থ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্তত পাঁচটি খাদ্যগোষ্ঠী থেকে খাবার খেতে পারে না।

অথচ, শিশুদের মাঝে ভিটামিন-এ সাল্লিমেন্টেশন কভারেজ প্রায় ৯৯শতাংশ, যা বাংলাদেশের অন্যতম সফল জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি বাংলাদেশে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারকারী পরিবারের হার প্রায় ৭৬শতাংশ। অথচ, ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ। মাছ, সবজি ও ফলের উৎপাদনও আগের তুলনায় বেড়েছে। পরিসংখ্যান দেখায় যে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করলেও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা, বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস এবং শিশু পুষ্টি এখনও বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। মোটা দাগে চ্যালেঞ্জগুলো কী কী, তা যদি দেখতে বসি, তাহলে মুখোমুখি হতে হয় সত্যের। অনেক পরিবার পর্যাপ্ত খাবার কিনতে পারে না, বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে। অনেক মানুষ ভাত বেশি খেলেও পর্যাপ্ত প্রোটিন, দুধ, ডিম, ফল ও শাকসবজি খেতে পারেন না। খাদ্যে ভেজাল, কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ এবং অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাত খাবারও জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে কৃষি উৎপাদনে। এরপরে আছে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থায় সুশাসনের অভাব। এ কারণে বলা যায়, দেশে খাদ্যের প্রাপ্যতা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে, কিন্তু সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য ও সুষম পুষ্টি এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

কীভাবে সম্ভব হবে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও সুষম পুষ্টির টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে বিশেষজ্ঞরা নানা সময়ে পরামর্শ দিয়েছেন রাষ্ট্রকে। এর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাইছি। নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, সবার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, সুষম খাদ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, শিশু-গর্ভবতী নারী ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ পুষ্টি কর্মসূচি, কৃষিতে জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। খাদ্যের অপচয় কমানোর বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি এবং তা হতে হবে জাতীয়ভাবে। প্রচলিত একটি কথা আছে, পেটের খিদের চেয়ে আমরা নাকি চোখের খিদেকে গুরুত্ব দিয়ে থালা ভর্তি করি এবং না খেতে পেরে খাবার অপচয় করি। সুপারমার্কেট, রেস্টুরেন্ট এবং পরিবার—সবখানেই প্রচুর খাবার নষ্ট হয়।

অর্থাৎ, খাদ্য উৎপাদনে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছি, কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির পূর্ণ নিশ্চয়তা অর্জনের জন্য এখনও অনেক কাজ বাকি। এটি শুধু কৃষি উৎপাদনের বিষয় নয়; অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক সুরক্ষার সঞ্চে ও গভীরভাবে সম্পর্কিত। উন্নত দেশগুলোর মত কঠোর খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন জাতীয় দাবি। খামার থেকে সুপারমার্কেট পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে খাদ্যের মান পরীক্ষা করতে হবে। যদি কোনো খাদ্যে ক্ষতিকর জীবাণু, রাসায়নিক বা দূষণ ধরা পড়ে, তবে দ্রুত বাজার থেকে তা প্রত্যাহার (food recall) করতে হবে। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি যেমন ড্রোন দিয়ে ফসল পর্যবেক্ষণ, সেন্সর ব্যবহার করে সেচ নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দিয়ে রোগ শনাক্তকরণ, সয়ংক্রিয় কৃষিযন্ত্র ও রোবটের ব্যবহার খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি খাদ্যের অপচয় কমাতে হবে।

এইবার আসুন, নাগরিকের পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার হার সম্পর্কে। খাদ্যের মোড়কে ক্যালোরি, চিনি, লবণ, চর্বি, ভিটামিনসহ বিভিন্ন তথ্য স্পষ্টভাবে লেখা থাকে। আমরা ক’জন এসব পড়ে দেখি এবং পড়ার পর বুঝতে পারি কোন খাদ্য উপাদান আমার বেশি খাওয়া দরকার আর কোন খাদ্য উপাদান বর্জন করাই ভালো? উন্নত বিশ্বের মত আমাদের দেশেও স্কুলে শিশুদের পুষ্টি শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তা যেন শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য। শিশুরা দেদারসে চিপস, বিস্কুটের মত জাংক ফুড খাচ্ছে এবং বাবা-মায়েরাও এতে কিছু মনে করছেন না। এর ফলে অপুষ্টির পাশাপাশি অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতাও বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ধীরে ধীরে বাড়ছে। স্বাস্থ্যকর খাবারকে উৎসাহিত করা হবে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার।

এই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগে বেড়ে ওঠা ধনী পরিবারগুলোতে অতিরিক্ত চিনি, চর্বি ও অতিপ্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার কারণে স্থূলতা বেড়েছে, তা এখন হয়ে গেছে বড়ো জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এর ফলে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ বেড়ে যায়। “খাবারের অভাব” নয়, বরং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য অপচয়, অতিপ্রক্রিয়াজাত খাবারের প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সামাজিক বৈষম্য—এসব নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর প্রায় ৭১ শতাংশ অসংক্রামক রোগের কারণে ঘটে, যার মধ্যে ১৯ শতাংশই অকাল মৃত্যু।

এ পরিস্থিতিতে খাদ্যপণ্যের প্যাকেটের সামনের অংশে সহজবোধ্য স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা বা ফ্রন্ট-অব-প্যাকেজ লেবেলিং (ঋগুচখ) চালু করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা খাদ্যপণ্যের পেছনে থাকা জটিল পুষ্টি তথ্য সাধারণ ভোক্তার জন্য বোঝা কঠিন হয়। সহজবোধ্য ও কার্যকর সতর্কীকরণ লেবেল চালু হলে ভোক্তাদের আরও ভালভাবে সচেতন করা যাবে এবং ভোক্তা সহজে স্বাস্থ্যকর খাদ্য নির্বাচন করতে পারবেন। অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধেও এটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

এবছরের বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান খাদ্য নিরাপত্তাকে একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়নকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার আহবান জানিয়েছেন। সামাজিক বৈষম্য কমাতে তঁার সরকারের প্রকাশিত কর্মপরিকল্পনায় সামাজিক সুরক্ষা, দরিদ্র মানুষের কাছে সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া, কৃষক ও সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২০২৫-২০২৭ সময়ের জন্য National Food Environment Strateg প্রণয়নের কাজ চলছে। এর লক্ষ্য হলো মানুষের জন্য আরও স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশ তৈরি করা, যাতে পুষ্টিকর খাবার সহজে পাওয়া যায় এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রভাব কমানো যায়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (ফ্যামিলি কার্ড, ক্রীড়া কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিএফ, ভিজিডি ইত্যাদি) অনেক দরিদ্র পরিবারকে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয়ে সহায়তা করছে। বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি ও কিছু এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি শিশুদের পুষ্টি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। কেননা দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারগুলো প্রথমেই পুষ্টিকর খাবার কমিয়ে দেয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্মসূচি হলো—খাদ্যে ভেজাল ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য পরীক্ষাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদন থেকে বাজার পর্যন্ত নিরাপত্তা তদারকি, নিরাপদ খাদ্যবিষয়ক জনসচেতনতা গড়ে তোলা, রেস্টোরাঁ, খাদ্য কারখানা ও বাজারে তদারকি। ২০২৬ সালে জাইকার সহায়তায় একটি বড়ো প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় রেফারেন্স ফুড ল্যাব, চট্টগ্রাম ও খুলনায় নতুন পরীক্ষাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ভেজালবিরোধী অভিযান চালাচ্ছে, অতিরিক্ত মূল্য আদায় রোধ, মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য জব্দ, ভুল লেবেলিং ও প্রতারণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ, ভোক্তার অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং জনসচেতনতা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এই মাসেই প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছেন।

অর্থাৎ, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য ও ভোক্তা সুরক্ষা নিয়ে সরকারি কর্মসূচি যথেষ্ট সক্রিয়। পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য অপচয় হ্রাস এবং অতিপ্রক্রিয়াজাত খাবারের ব্যবহার কমানো—এই বিষয়গুলোতে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে আশা করছি। বিশেষ করে, স্থূলভিত্তিক পুষ্টি শিক্ষা ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশ বৈরির উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করা যেতে পারে কেননা, শিশুরাই আমাদের আগামী।

#

লেখক: উপ প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার